পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭

উত্তরণ

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

নিশিকান্ত চক্রবর্তী শিক্ষক
নওদাপাড়া জুনিয়র হাই স্কুল, বর্ধমান

থিয়োরির পাশাপাশি হাতে-কলমে অভ্যাসের ওপর জোর দাও

সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশোনা করার পাশাপাশি প্রতিটি বিষয় হাতে-কলমে অভ্যাস করা জরুরি। এতে পড়াশোনার আগ্রহ বাড়বে। যেমন যদি বিজ্ঞানের বিষয়ের ক্ষেত্রে শুধু থিয়োরি পড়ে গেলে হবে না, প্র্যাকটিক্যাল বিষয়টি অভ্যাস করা খুব প্রয়োজন। বাড়িতেও একজন পড়ুয়া গৃহস্থালির ব্যবহৃত জিনিসগুলি দিয়ে সে বিজ্ঞানভিত্তিক কিছু কাজ হাতে-কলমে করে অভ্যাস করতে পারে। পড়াশোনার আগ্রহ পড়ুয়াদের মধ্যে বাড়িয়ে তুলতে হবে, বা ছাত্রছাত্রীরাও যখন এই ভাবে নিজে থেকে হাতে-কলমে অভ্যাস করবে তখন তাদের মধ্যে ভীতি দূর হয়ে আলাদা ভালোলাগা তৈরি হবে।

পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত যেভাবে রুটিন তৈরি করা হয়েছে, তাতে ওদের টিউশন করার প্রবণতাকে বা নির্ভরশীলতাকে কিছুটা কমানো হয়েছে। আর সিলেবাসও এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে সারাদিন বই নিয়ে বসে থাকতে হবে এমন কোনও কথা নেই। শিক্ষকরা তো পড়ুয়াদের পাশে সব সময় আছেন, তবে অভিভাবকদেরও সব সময় খেয়াল রাখা উচিত তাদের সন্তানের পাঠাভ্যাসের দিকে। পাশাপাশি দিনের পড়া দিনেই করার কথা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকেই বলা হয়। শিক্ষকরা ক্লাসে যে বিষয়টি নিয়ে পড়াচ্ছেন সেটি বাড়ি ফিরে গিয়ে সেদিনই তৈরি করে রাখলে ভালো হয়। তাহলে পড়াটি মাথায় গেঁথে

এরপর ছয়ের পাতায়

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

আজকের ছাত্রছাত্রীরা আগামীর রূপকার। আর ছাত্রের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের যতটা ভূমিকা থাকে সমান ভূমিকা থাকে শিক্ষকেরও। মার্কিন শিক্ষাবিদ বব বেয়াউপ্রেজ বলেছেন, 'শিক্ষা হল একজন নিবেদিত শিক্ষক, একজন অনুপ্রাণিত ছাত্র এবং একজন উদ্যমী অভিভাবকের মিলিত প্রতিশ্রুতি।' শিক্ষকরা হবেন প্রথমে অভিভাবক, তারপর বন্ধু। ফলে অভিভাবক ও বন্ধুত্বের একটি মিশ্রণ থাকবে শিক্ষকের মধ্যে। আর ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক হবে খানিকটা শ্রদ্ধামিশ্রিত বন্ধুত্বের।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই একজন শিক্ষার্থীকে প্রকৃত মানুষ হিসাবে তৈরি করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব পালন করতে হয় একজন শিক্ষককে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের কাছে বাবা-মায়ের মতো। বাবা-মা যেমন তাদের ভালোবাসা-স্নেহ-মমতা দিয়ে সন্তানদের বড় করেন, ঠিক তেমনি শিক্ষকেরা শিক্ষার আলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যান। এর সঙ্গে থাকে স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা। তাঁদের শিক্ষার আলো যেমনি শিক্ষার্থীদের সামনের পথ চলাকে সুদৃঢ় করে, তেমনি তাদের স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে। একজন শিক্ষক হলেন একজন ছাত্রের পথপ্রদর্শক। তাই ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে ভীতিপূর্ণ বা অত্যাধিক শাসনের সম্পর্ক ছাত্রের সমস্যাগুলোকে শিক্ষকের কাছে খোলাখুলি তুলে ধরতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

বলতে গেলে শিক্ষক সভ্যতার অভিভাবক, সমাজের অভিভাবক। কার্যত শিক্ষক বলতে একজন আলোকিত, জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি সভ্যতার বিবর্তনের অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁর আচার-আচরণ, মন ও মননে নিজেই বটবৃক্ষের প্রতীক। তাঁর ভিত্তি হল পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা, নির্মল চারিত্রিক গুণাবলি, জ্ঞান সঞ্চারণে আন্তরিক সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টা। তাই প্রকৃত শিক্ষক বলতে এমন এক অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ববান জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিকে বোঝায়; যিনি শিক্ষার্থীকে শিখন প্রক্রিয়ায়, জ্ঞান অন্বেষণ ও আহরণে, মেধার বিকাশে, শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনে, নৈতিক ও মানসিক গুণাবলি অর্জনে এবং সমাজ বিবর্তনে অনুঘটকের কাজ করেন এবং সুশীল সমাজ তৈরিতে যিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ছাত্রের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক খুবই জরুরি একটা বিষয়।

ছাত্রের কাছে শিক্ষক একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। শুধু পড়াশুনোই নয় ছাত্রের চরিত্রগঠনেও অনেকখানি দায়িত্ব থাকে শিক্ষকের। একজন প্রকৃত শিক্ষকই দিতে পারেন মূল্যবোধের শিক্ষা। যেটা একজন ছাত্রের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শুধু পড়াশোনাই একজন ছাত্রের আদর্শ মানুষ হবার জন্য সবকিছু নয়, সমাজের প্রতিও তার দায়বদ্ধতা থাকে। এই মূল্যবোধ শুধুমাত্র অভিভাবকরাই নয় শিক্ষকের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার ওপরেও অনেকটাই নির্ভর করে।

শিক্ষক আর ছাত্রের সম্পর্ক হবে খুবই আন্তরিকতার। ছাত্রের কাছে শিক্ষক মানে একটা অন্যরকম আদর্শ। যেখানে সে তার মনের হাজারো প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাবে। একটি ছাত্রের বিনয়ী হওয়াটা খুব দরকার এবং শিক্ষকের প্রতি থাকা চাই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা ও বিনয় ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ককে আরও মধুর করে। একজন ছাত্র যেহেতু দিনের অনেকটা সময়ই স্কুলে থাকে তাই ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আর নিয়মানুবর্তিতা বা বড়দের সম্মান বা মানবিক মূল্যবোধগুলো শিক্ষকই ছাত্রের মধ্যে জাগরিত করতে পারেন। এক্ষেত্রে ছাত্রকে হতে হবে বিনয়ী। পড়াশুনো বিষয়ক সমাধান অনেক সহজ হয়ে যায় যদি ছাত্র তার শিক্ষককে নিজের সব সমস্যা নির্দ্বিধায় খুলে বলতে পারে। আর সেটা হলে তার বেড়ে ওঠার পথটা অনেক মসৃণ হবে।

ছাত্রের ক্ষেত্রে একটা জিনিস সবসময় মাথা রাখা উচিত, শিক্ষক তার কাছে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, অভিভাবক তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা যেন কখনওই ক্ষুণ্ণ না হয়। ছাত্রজীবন শেখার সময় তাই ছাত্র-শিক্ষকের সুমধুর সম্পর্কই একজন ছাত্রকে জীবনের সঠিক পাঠ দিতে পারে এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

জেনারেল নলেজ: ছয় ও আটের পাতায় || স্পেশাল টিউশন: তিনের পাতায়
ক্লাস (নাইন-টেন) টিউশন: চার ও পাঁচের পাতায় || ক্যুইজ: সাতের পাতায়

উত্তরণ-এর মুখোমুখি: রোল নং ওয়ান

আলিমুদ্দিন নবম শ্রেণি
ইছাপুর এন সি হাই স্কুল

পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে নিয়মিত ধ্যান করি

ভালো করে পড়াশোনা করার জন্য খেলাধুলা খুব জরুরি। তাহলে দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ঘটবে। পড়াশোনার প্রতি আরও মনোযোগ বাড়বে। এমনই বিশ্বাস করে ইছাপুর এন সি হাই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র আলিমুদ্দিন। বার্ষিক পরীক্ষাতে ৭৩৪ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থানাধিকারী করেছে। বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখে আলিমুদ্দিন।

উত্তরণের মুখোমুখি হয়ে প্রতিদিনের পড়াশোনার অভ্যাস শেয়ার করল আলিমুদ্দিন।

উত্তরণ: প্রতিদিন পড়াশোনার জন্য কতক্ষণ সময় দাও?

আলিমুদ্দিন: প্রতিদিন ভোর ৫ টার সময় ঘুম থেকে উঠি। তারপর সকাল সাড়ে ন'টায় স্কুলে যায়। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসে কিছুক্ষণ খেলাধুলা করে আবার পড়তে বসি।

উত্তরণ: একসঙ্গে টানা কতক্ষণ পড়াশোনা করো?

আলিমুদ্দিন: রাতে টানা আট থেকে ন'ঘণ্টা পড়াশোনা করি।

উত্তরণ: পড়াশোনা মনে রাখার জন্য কী করো?

আলিমুদ্দিন: যে কোনও বিষয় লিখে অভ্যাস করাটা খুব জরুরি। তাহলে সেই পড়াটা মনে থাকে। পরীক্ষার সময়েও খুব সহজে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। লিখে পড়লে বানানও কম ভুল হয়।

উত্তরণ: ভালো রেজাল্টের জন্য সারাদিন ধরে পড়াশোনা করা জরুরি?

আলিমুদ্দিন: না। তবে যখন যে বিষয়টি পড়ব তখন সেটি মন দিয়ে পড়লে সময় কম লাগে।

উত্তরণ: পড়াশোনা ছাড়া আর কী করতে ভালো লাগে?

আলিমুদ্দিন: খেলাধুলা করতে আমি খুব ভালোবাসি। সময় পেলেই বন্ধুদের সঙ্গে খেলি। খেলাধুলা আমাদের মানসিক আনন্দ দেয়। তাই মন ভালো থাকলে যে কোনও কাজই খুব ভালোভাবে হয়। তবে খেলাধুলা ছাড়া আমি গল্পের বই পড়তেও ভালোবাসি।

উত্তরণ: পড়াশোনার জন্য স্কুল থেকে কীরকম সাহায্য পাও?

আলিমুদ্দিন: অনেক সাহায্য পাই। শিক্ষকরা ছাড়া পরিবারের লোকেরাও আমাকে সবসময় এগিয়ে চলার পথে অনুপ্রেরণা দেয়।

উত্তরণ: মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এখন থেকে নিশ্চয়ই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছ?

আলিমুদ্দিন: এখনও কিছু শুরু করিনি। তবে পড়াশোনার সময় আরও বাড়াতে হবে। আমি প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন সেরে ফেলি। সেইসঙ্গে শিক্ষকদের সাজেশন ছাড়া নিজে প্রশ্নোত্তর তৈরি করে সেগুলি সমাধান করে থাকি। পাঠ্যবইগুলিও খুঁটিয়ে পড়ি।

উত্তরণ: তুমি জীবনে সফল হও।

তরঙ্গ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭

সকলের জন্য শিক্ষা

মানুষের জ্ঞান, চিন্তা ও চেতনার বিকাশ ঘটতে পারে শিক্ষার মাধ্যমেই। প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া জীবনে এক পা-ও এগোনো সম্ভব নয়। সুশিক্ষা এবং মেধার মাধ্যমেই একজন মানুষ নিজেকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সর্বোপরি শিক্ষা হল সকলের মৌলিক অধিকার। তাই দেশের প্রত্যেকটি মানুষের সাক্ষর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নিরক্ষরতা একজন মানুষের জীবনের সবথেকে বড় প্রতিবন্ধকতা। তেমনই একটি দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বেশি থাকলে নিরক্ষরতাই সেই দেশের উন্নয়নের সবথেকে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্যেই ইউনেস্কোর আহ্বানে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করতে এবং নিরক্ষর মুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে ১৯৬৬ সাল থেকে ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে। বিশ্বের সকল মানুষকে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করতে এবং সমাজের সর্বস্তরে নিরক্ষতা দূরীকরণ করতে প্রতিবছর এইদিনটি পালন করা হয়।

শুধুমাত্র মানুষকে সচেতন করলেই চলবে না। সকলে যাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং শিক্ষা অর্জনের পর সেই শিক্ষা কাজে লাগাতে পারে সেইদিকেও নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একটা সময় ছিল যখন শুধমাত্র স্বাক্ষর জ্ঞান থাকলেই তাকে সাক্ষর বলা হত। ১৯০১ সালে মানুষ গণনার অফিসিয়াল ডকুমেন্টে যে ব্যক্তি নিজের নাম লিখতে পারবেন তাঁকেই সাক্ষর বলা হত। এরপর ১৯৪০ সালে ছোট ছোট বাক্য লিখতে ও পড়তে পারা এবং সহজ হিসাবনিকাশ করতে পারা ব্যক্তিকেই সাক্ষর হিসেবে চিহ্নিত করা হত। আশির দশকে লেখাপড়া ও হিসাবনিকাশের পাশাপাশি সচেতনতা ও দৃশ্যমান বস্তুসামগ্রী পঠনের ক্ষমতা সাক্ষরতার দক্ষতা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে সাক্ষরতার সঙ্গে যোগাযোগের দক্ষতা, ক্ষমতায়নের দক্ষতা, জীবন নির্বাহী দক্ষতা, প্রতিরক্ষার দক্ষতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতাও তালিকাভুক্ত হয়েছে।

সাক্ষরতার দিক দিয়ে বিশ্বে ভারতের অবস্থান ১৪৭তম। এখানে সাক্ষরতার হার প্রায় ৬১ ভাগ। প্রথমে রয়েছে জর্জিয়া। এদেশের সাক্ষরতার হার ১০০ ভাগ। জর্জিয়া যদি পারে ভারত পারবে না কেন? আমরা কি কোনোদিনও বলতে পারব না ভারতবর্ষ নিরক্ষরতা দূরীকরণে সক্ষম হয়েছে? সাক্ষরতা দিবস পালন করলেই তো দেশের সব মানুষকে সাক্ষর করা সম্ভব নয়, তাই নয় কি? এরজন্য আরও বেশি করে মানুষকে সচেতন করতে হবে। কারণ, সাক্ষরতা মানুষকে সচেতন এবং আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। দারিদ্র মুক্ত দেশ গড়তে প্রথমেই চাই শিক্ষা। দেশের নাগরিকদের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে শিক্ষিত করতে পারলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ করা সম্ভব হবে। তাই শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। সকলে যাতে শিক্ষা গ্রহণে সুযোগ পায় সেদিকে নজর দিতে হবে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোনওরকম ভেদাভেদ রাখা উচিত নয়। সাক্ষর সমাজ মানেই বাস্তববাদী ও যুক্তিবাদী জনগণ। যে দেশের জনগণ বাস্তববাদী এবং যুক্তি সম্পন্ন হবেন, সেই দেশের উন্নতিও ক্রমবর্ধমান হবে। সারা বিশ্বে লক্ষ করা যায় সাক্ষরতা আর উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে দেশে সাক্ষরতার হার বেশি তারাই উন্নয়নে এগিয়ে রয়েছে। দেশ ও জাতির উন্নয়নে প্রকৃত সাক্ষরতা অর্জনের জন্য পরিকল্পনা করে তার বাস্তবায়ন জরুরি।

সাক্ষরতার হার বাড়াতে ১৯৯১ সালে সর্বপ্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের শিক্ষাবৃত্তি ও বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়েও শিক্ষাবৃত্তি চালু করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র। কিন্তু তবুও নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। এরজন্য সমাজকে আরও বেশি করে সচেতন হতে হবে। মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। কারণ, লক্ষ করলে দেখা যাবে বর্তমানে এদেশে এখনও এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা ঠিকমতো নিজের নামটুকুও লিখতে পারেন না। তাঁদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও নেই। রাস্তায় চলতে চলতে কত পরিবার দেখা যায় যাদের বসবাসের ঠিকানা ফুটপাত। তারা কি সাক্ষর? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উত্তর আসবে, না। এঁরা সাক্ষর না হলে এঁদের সন্তানদের সাক্ষর করবেন কী করে? নতুন প্রজন্মই তো উজ্জ্বল দেশ গড়ার কারিগর। এইভাবে কি উজ্জ্বল দেশ গড়া সম্ভব? তাই সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করতে এবং নিরক্ষর মুক্ত দেশ গড়তে নারী, কন্যাশিশু, পথশিশু, কর্মজীবী শিশু-কিশোর, দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন এলাকা, প্রতিবন্ধী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পতিতালয়, সকল সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়, অনাথ ও ভবঘুরে আশ্রয়কেন্দ্রের নারী ও শিশু, তরুণদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

সকলকে একটা কথা মনে রাখতে হবে শিক্ষা সুযোগ নয়, এটা অধিকার। শিক্ষাকে জাতীয়করণ করতে হবে। সকলে শিক্ষিত হলে, নিরক্ষর-মুক্ত দেশ গড়তে পারলে নিপীড়িত, শোষিতদের সংখ্যাও কমবে। দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষকে নিরক্ষর-মুক্ত করাটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবেই আমরা দেশ ও জাতির জন্য গর্ব করতে পারব।

রেশমি চন্দ্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭

স্পেশাল টিউশন: ইংলিশ গ্রামার

Adjective , Verb & Adverb

আগের টিউশনের পর

Adjective

Adjective (বিশেষণ): যে Word দ্বারা Noun বা Pronoun-এর দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ ও সংখ্যা বোঝায় তাকে Adjective বলে। যেমন: 1. She is a beautiful girl. 2. My Shirt is green. 3. You have three pens. 4. Raju is ill .

Adjective-এর প্রকারভেদ: Adjective চার প্রকার। যথা— 1) Adjective of quality (গুণবাচক বিশেষণ), 2) Adjective of quantity (পরিমাণবাচক বিশেষণ), 3) Adjective of number (সংখ্যাবাচক বিশেষণ), 4) Possesive Adjective (সম্বন্ধবাচক বিশেষণ)

1) Adjective of quality (গুণবাচক বিশেষণ): যে সকল Adjective কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর দোষ, গুণ ও অবস্থা প্রকাশ করে তাকে Adjective of quality বলে। যেমন: beautiful, bad, good, ill ইত্যাদি।

2) Adjective of quantity (পরিমাণবাচক বিশেষণ): যে Adjective দ্বারা কোনও বস্তুর পরিমাণ বোঝায় তাকে Adjective of quantity বলে। যেমন: some, little, many, much, enough ইত্যাদি।4) Adjective of number (সংখ্যাবাচক বিশেষণ): যে Adjective দ্বারা কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা বোঝায় তাকে Adjective of number বলে। যেমন: Two, Three, Ten, nine ইত্যাদি।

Possessive Adjective (সম্বন্ধবাচক বিশেষণ): যে Adjective কোনও Noun-এর পূর্বে বসে ওই Noun-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে Pronominal Adjective বলে। যেমন— 1. This is my pen. 2. That is her book. 3. This is your pencil. এখানে my, her ও your যথাক্রমে Noun pen, book ও pencil-এর পূর্বে বসে এদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, এগুলি হল Possessive Adjective.

Verb

Verb (ক্রিয়া): যে Word দ্বারা কোনও কাজ করা বোঝায় তাকে Verb বা ক্রিয়া বলে। যেমন: go, eat, do, read, work, drink, write ইত্যাদি।

Verb এর প্রকারভেদ: Verb প্রধানত দুই প্রকার— Principle Verb (প্রধান ক্রিয়া) ও Auxiliary Verb (সাহায্যকারী ক্রিয়া)।

Principle Verb (প্রধান ক্রিয়া): যে Verb অন্য কোনও Verb-এর সাহায্য ছাড়া স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে তাকে Principle Verb বলে। যেমন— 1. Rajesh goes to school. 2. Rabi reads a book. 3. They play football. 4. Mohima wrote a letter. এই Sentence গুলোতে যথাক্রমে go, read, play ও wrote অন্য কোনও Verb-এর সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করেছে তাই এগুলোকে Principle Verb বলে।

Auxiliary Verb (সাহায্যকারী ক্রিয়া): যে সকল Verb এর নিজস্ব কোনও অর্থ নেই এবং বিভিন্ন ধরনের Sentence গঠনে Principle Verb কে সাহায্য করে তাকে Auxiliary Verb বলে। যেমন— 1.Rajesh is going to school. 2. Rabi was reading a book. 3. They were playing. এই তিনটি Sentence এ is, was, were যথাক্রমে going, reading ও playing এই Principle Verb গুলোকে অর্থ প্রকাশে সাহায্য করেছে তাই এগুলোকে Auxiliary Verb বলে।

Adverb

Adverb (ক্রিয়া বিশেষণ): যে Word কোনও Verb, Adjective বা অন্য কোনও Adverb কে modify করে তাকে Adverb বলে। যেমন—

He is a very good man.

The tiger is an extremely ferocious animal.

The khaitans are enormously rich.

He is daily absent.

উপরের বাক্যগুলিতে very,extremely, enormously,এবং daily শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে good,ferocious, rich এবং daily সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য। তাই এগুলি Adverb modifying verbs.

The train runs fast.

It is raining heavily.

He comes daily.

She sings sweetly.

উপরের বাক্যগুলিতে fast, heavily, daily এবং Sweet ক্রিয়াবাচক শব্দ runs, raining, comes এবং sings সম্বন্ধে কিছু বলে। অতএব এগুলিও adverb modifying verbs.

The girls dances very well.

The plane is flying too high.

উপরের বাক্যগুলিতে very এবং too অন্য দুটি Adverb well এবং high সম্বন্ধেই কিছু বলছে। সুতরাং adverb অন্যান্য adverb কেউ modify করে।

সম্বন্ধসূচক অব্যয় বা Preposition এর আগেও Adverb ব্যবহার হয়। যেমন— The rain came just after his his arrival.

He entered the room immediately before I had entered it.

স্পেশাল টিউশন: কম্পিউটার

ইন্টারনেট ও তার ব্যবহার

দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটের ব্যবহারের কোনও শেষ নেই। সাধারণত আমরা দিন শুরু করি খবরের কাগজ পড়ে। কিন্তু আজ আর শুধু কাগজে ছাপা খবরের কাগজই নয়, ইচ্ছা হলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন খবরের কাগজেও খবরাখবর পড়া যায়। আগে খবরের কাগজের পাশাপাশি আমরা রেডিও বা টেলিভিশনে খবর শুনতাম, দেখতাম; এখন সেটিও ইন্টারনেট-নির্ভর হয়ে গেছে। ঘর থেকে বার হয়ে রাস্তাঘাটের তথ্য আমরা ইন্টারনেট থেকে পেয়ে যাই। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম বা জিপিএস আমাদের অবস্থানটি নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারে। তাই কোনও ঠিকানা ইন্টারনেটের সাহায্যে খুব সহজে পাওয়া যায়। বর্তমানে নতুন সব গাড়িতেই পথ দেখানোর জন্য জিপিএস লাগানো থাকে। এখন কর্মক্ষেত্রে কম-বেশি সবাই ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীল। অফিশিয়াল কাজে ই-মেল আদানপ্রদান নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। ইন্টারনেটে আজকাল দেশ-বিদেশে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সামনাসামনি দেখে কথা বলার প্রচলন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জীবনকে আনন্দময় করার জন্য বিনোদনের একটি ভূমিকা থাকে। ইন্টারনেট বিনোদনের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা রাখছে। এখন ঘরে বসেই অনেক লেখকের বই, ই-বুক হিসাবে ইন্টারনেট থেকে পড়া যায়। শুধু বই নয়, খেলা, গান, চলচ্চিত্র-সহ অনেক বিনোদনের উপাদান এখন ইন্টারনেটের কারণে অনেক বেশি সহজলভ্য হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির ফলে বিশ্বের যেসব দেশ এগিয়ে আছে, তারা সবসময় ইন্টারনেট ছাড়া একটি মুহূর্তও চলতে পারে না।

আধুনিক জীবনযাপনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে করেছে উন্নত, জীবনযাত্রাকে করছে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। ইন্টারনেটের ব্যবহার আমাদের জীবনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রতিনিয়ত দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইন্টারনেটে বিভিন্ন তথ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গবেষণা, পরিবহণ, বাণিজ্য থেকে শুরু করে যাবতীয়।

দৈনন্দিন জীবনে নানা সমস্যা সমাধানের প্রথম হাতিয়ার হচ্ছে তথ্য। ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহের পর সেটি ব্যবহার করে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। বিশ্বের জনপ্রিয় তথ্য খোঁজার সাইট বা সার্চ ইঞ্জিন হল গুগল (www.google.com). এতে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তথ্য খুঁজে বের করা যায়। শিক্ষাসংক্রান্ত প্রায় সব ধরনের সহায়ক তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য ইন্টারনেটে অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে। ওলফ্রামআলফা (www.wolframalpha.com) নামে একটি বিশেষ ওয়েবসাইট আছে, যেখানে বিভিন্ন গাণিতিক কাজ করার ব্যবস্থা রয়েছে, এখানে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যারও সমাধান পাওয়া যায়। এ ছাড়া দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার জন্য ইন্টারনেটভিত্তিক অনেক সহায়তা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। মোবাইল কোম্পানিগুলোর ইন্টারনেট সাপোর্ট সেন্টারগুলো গ্রাহকদের মোবাইল ফোনসংক্রান্ত সমস্যাবলির সমাধান করে থাকে। আবার অনেক ই-মেলভিত্তিক সেবাকেন্দ্র বিশ্বজুড়ে পরিচালিত হয়। এসব সেবাকেন্দ্র থেকে ই-মেলের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়।

সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম যেমন— ব্লগ, ফেসবুকের মাধ্যমে সমমনা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা যায়। এর ফলে অনেক স্থানীয় সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে।

এরকম নানাভাবে ইন্টারনেট তথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে থাকে।

ই-মেল: ই-মেল কথাটির অর্থ হল 'ইলেট্রনিক মেল' বা ইলেকট্রনিক চিঠি। ই-মেলের মাধ্যমে আমরা কোনও লেখা বা ছবি অন্য যে কোনও ই-মেল ঠিকানায় ইলেকট্রনিকভাবে পাঠাতে পারি। যাদের ই-মেল ঠিকানা থাকে তাদের প্রত্যেকের একটি করে মেলবক্স থাকে। কোনও ই-মেল ঠিকানা থেকে ই-মেল এলে তা মেলবক্সে জমা হয়। ঠিকানাটি যার সে মেলবক্স থেকে ই-মেলটি যখন ইচ্ছা খুলে পড়তে পারে। এই মেল পড়া ও পাঠানোর কাজটি প্রায় সময়ই বিনা পয়সায় করা যায়। ই-মেলের সঙ্গে যে কোনও ফাইল যুক্ত করা যায়। সেটি হতে পারে ওয়ার্ড ডকুমেন্ট, এক্সেল ফাইল বা ছবি। ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত একটি কম্পিউটার থাকলেই বিনামূল্যে ই-মেল ঠিকানা খোলা যায়। ই-মেল অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে পাঠানো যায়। ই-মেল গ্রহণের জন্য কম্পিউটার খোলা থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। দিন-রাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনও সময় ই-মেল পাঠানো যায় আবার পড়াও যায়। একসঙ্গে অনেককে একই চিঠি পাঠানো যায়। গোপনীয়তা বজায় রেখেও ই-মেল পাঠানো যায়। তবে ই-মেল খোলার ব্যাপারে কিছু সতর্কতা জরুরি। যেমন সন্দেহভাজন কোনও ই-মেল এলে তা খোলা উচিত নয়। কারণ, এর সঙ্গে ভাইরাস কম্পিউটারের ক্ষতি করতে পারে।

ওয়েবে অনেক ই-মেল খোলার সাইট রয়েছে; যেমন— ইয়াহু মেল সার্ভিস, জি-মেল ইত্যাদি।

পরবর্তী টিউশনে আমরা মাইক্রোসফট এক্সেল নিয়ে আলোচনা শুরু করবো।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
উত্তরণ
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিদিশা রায়চৌধুরী** (অসম), **সালমা আহমেদ, বিপাশা চক্রবর্তী**

ক্লাস নাইন-এর টিউশন: ভূগোল

প্রাকৃতিক সম্পদ

আগের অংশে সম্পদ ও তার শ্রেণিবিভাগ জেনেছি। এইবার আমরা খনিজ সম্পদ নিয়ে আলোচনা করব। খনিজ সম্পদ যা আমরা মূলত প্রকৃতি থেকে পেয়ে থাকি, তার গুরুত্ব মানবজীবনে অপরিসীম। ভারতে প্রচুর পরিমাণে খনিজ সম্পদ মজুত আছে। ভারতের খনিজ সম্পদকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। সেগুলি হল যথাক্রমে—

১) **জ্বালানি খনিজ:** কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি হল জ্বালানি খনিজ। এগুলিকে শক্তি সম্পদও বলা হয়।

২) **ধাতব খনিজ:** আকরিক লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, তামা, টিন— এগুলি হল ধাতব খনিজ।

৩) **অধাতব খনিজ:** সালফার, ফসফরাস, কার্বোনেট ইত্যাদি হল অধাতব খনিজ।

আকরিক লোহা

খনি থেকে যে লোহা তোলা হয় তাকে বলে আকরিক লোহা। এগুলি অশোধিত অবস্থায় থাকে, পরে কারখানায় এগুলি পরিশোধন করে কাঁচা লোহা পাওয়া যায়। এই কাঁচা লোহা পিগ আয়রন নামে পরিচিত। এর সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ মিশিয়ে ইস্পাত তৈরি করা হয়, যা আমাদের চলার পথে নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। তাই এর গুরুত্ব অনেক।

ব্যবহার: (ক) সংকর ইস্পাত দিয়ে নানারকম যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ তৈরি হয়। (খ) গোটা পৃথিবীতে যেসব সেতু, রেলপথ, মালগাড়ি, জাহাজ, ট্রাক, রেলইঞ্জিন ইত্যাদি লোহা-ইস্পাত দিয়ে তৈরি হয়। (ঘ) বাসনপত্র, টেবিল, আসবাবপত্র ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরির কাজে লোহা ব্যবহার করা হয়। লোহার ব্যাপক ব্যবহারের কারণে বর্তমান যুগকে লৌহযুগ বলা হয়।

লোহার শ্রেণিবিভাগ: আকরিক লোহা মূলত চার প্রকারের হয়—

১) ম্যাগনেটাইট লোহা: কালচে রঙের হয় এবং ৭৫ ভাগের বেশি লোহা থাকে এতে।

২) হেমাটাইট লোহা: ৬৫ থেকে ৭০ ভাগ লোহা থাকে এতে, এই লোহা ভারতে সবথেকে বেশি পাওয়া যায়।

৩) লিমোনাইট লোহা: ৫০ ভাগের কম লোহা থাকে এতে।

৪) সিডেরাইট লোহা: সবথেকে কম লোহা থাকে এতে, শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ। এই লোহা ধূসর বাদামি রঙের হয়।

আঞ্চলিক বণ্টন: মূলত ভারতের মালভূমি অঞ্চলে লৌহখনিগুলি অবস্থিত। প্রধান প্রধান লৌহখনিগুলি সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হল—

(ক) ওড়িশা: ওড়িশা লোহা উৎপাদনে ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এই রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ জেলার গরুমহিষাণী, বাদাম পাহাড়, সুলাইপাত, কেওনঝড় জেলার বাগিয়াবুরু, নোয়ামুন্ডি, কিরিবুরু, এবং সুন্দরগড় জেলার বোনাই হল বিখ্যাত খনি।

(খ) ছত্তিশগড়: লোহা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে আছে ছত্তিশগড়। দুর্গ জেলার দাল্লি-রাজহারা এবং বস্তার জেলার বাইলাডিলা ও রাওগাট গুরুত্বপূর্ণ লৌহখনি অঞ্চল।

(গ) ঝাড়খণ্ড: লোহা উত্তোলনে ঝাড়খণ্ড তৃতীয় স্থানে আছে। এই রাজ্যের লোহাখনিগুলি হল— সিংভূম জেলার গুয়া, বুধাবুরু, কোটামাটিবুরু।

(ঘ) কর্ণাটক: কর্ণাটক লোহা উৎপাদনে চতুর্থ স্থানের অধিকারী। এই রাজ্যের বেলারি, চিত্রদুর্গ, চিকমাগালুর, টুমকুর ও বিজাপুর জেলায় আকরিক লোহা পাওয়া যায়। বাবাবুদান পাহাড়ের কেমানগুন্ডি বেলারি জেলার হসপেট ও চিকমাগালুর জেলার কুদরেমুখ প্রভৃতি হল বিখ্যাত লৌহখনি।

(ঙ) গোয়া: আকরিক লোহা উৎপাদনে গোয়া পঞ্চম স্থান অধিকার করে। এখানকার লৌহখনিগুলি হল— বিচোলেম, সানগুয়েম ও সিরিগাও।

এগুলি ছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল, কুডাপ্পা, নেল্লোর, গুনটুর এবং মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি, চান্দা এবং তামিলনাড়ুর সালেম, তিরুচিরাপল্লিতে লৌহখনি আছে।

লোহা উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান

অধিকার করেছে। ভারতে সঞ্চিত লোহার পরিমাণ ১,৭৫৭ কোটি টন। ভারত থেকে আকরিক লোহা জাপান, জার্মানি, পোল্যান্ড, ইতালি প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়।

কয়লা

ভারতের খনিজ সম্পদগুলির মধ্যে কয়লা অন্যতম। এটি একপ্রকার কালো বা ব্রাউন শিলা। বহু যুগ ধরে উদ্ভিদ ও প্রাণির দেহ মাটির নীচে চাপা পড়ে ধীরে ধীরে কয়লায় পরিণত হয়। প্রায় ২০-৩০ কোটি বছর আগের গঠিত কয়লাকে কার্বোনিফেরাস যুগের কয়লা বলে। এর পরবর্তী যুগের কয়লাকে টার্শিয়ারি যুগের কয়লা বলে।

কয়লার গুরুত্ব ও ব্যবহার: মানবজীবনে কয়লার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রথমত, কয়লা থেকে যে তাপশক্তি পাওয়া যায় তার দ্বারা কলকারখানা, রেলগাড়ি, জাহাজ প্রভৃতি চালানো হয়। দ্বিতীয়ত, রান্না করতে কোনও কিছু পোড়াতে কয়লা কাজে লাগে। তৃতীয়ত, কয়লা পুড়িয়ে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। সেই বিদ্যুৎ শিল্পে, পরিবহণ ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়। চতুর্থত, কয়লা পুড়িয়ে যে কোক পাওয়া যায় তা লৌহ, ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতু শিল্পের কাজে লাগে। পঞ্চমত, কোক তৈরির সময় আলকাতরা, পিচ, ন্যাপথা, অ্যামোনিয়া গ্যাস, ফেনল, গন্ধক প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়।

পরের ভাগে আমরা কয়লার শ্রেণিবিভাগ ও বণ্টন নিয়ে আলোচনা করব।

ক্লাস নাইন-এর টিউশন: জীবন বিজ্ঞান

প্রাণিকলা

আগের দিন আমরা যোগকলার মধ্যে অ্যারিওলার কলা, অ্যাডিপোজ কলা ও অস্থিকলা সম্পর্কে জেনেছিলাম। আজ আমরা যোগকলার অন্যান্য প্রকারগুলি সম্বন্ধে জানব। অন্যান্য যোগকলাগুলি হল—

তরুণাস্থি কলা: এই কলা অস্থির প্রান্তে, স্বরযন্ত্র ও স্বরনালিতে, পিউবিক অস্থির সংযোগস্থলে, মালাইচাকিতে, বহিঃকর্ণে, এপিগ্লটিস ইত্যাদিতে থাকে। এই কলার গঠনগত বৈশিষ্ট্য হল এটিতে কন্ড্রোসাইট কোষ থাকে, এটির ধাত্র কন্ড্রয়টিন সালফেট দ্বারা গঠিত এবং এতে কোলাজেন ও ইলাস্টিক তন্তুর ঘন জালক থাকে। এই কলার কাজ হল নাসিকার অগ্রভাগ, কানের লতি, স্বরযন্ত্র ইত্যাদি গঠনে সাহায্য করা, আশেপাশের অংশগুলিকে দৃঢ়তা প্রদান করে সন্ধির সংযোগস্থলকে মসৃণ রাখা।

রক্তকলা: আমাদের দেহের রক্তবাহক অর্থাৎ শিরা, ধমনি, ও রক্তজালক এবং হৃদ প্রকোষ্ঠে এই কলা দেখা যায়। এই কলা মূলত গঠিত হয় রক্তরস ও রক্তকণিকা দিয়ে। রক্তরসে জল ও কঠিন পদার্থ দুই-ই থাকে। লোহিত রক্তকণিকা শ্বাসবায়ু পরিবহণ করে। শ্বেত রক্তকণিকা দেহকে রোগ-জীবাণু থেকে রক্ষা করে। অণুচক্রিকা রক্ত-তঞ্চনে সাহায্য করে। রক্তরস বিভিন্ন পদার্থের পরিবহণে অংশ নেয়।

লিম্ফয়েড কলা: প্লীহা, লসিকাগ্রন্থি, ও থাইমাস গ্রন্থি, টনসিল ভিসেরাল নোড পেয়েরস পয়ঃস্বিনী, এবং পাকতন্ত্রীয় নালির শ্লেষা ঝিল্লিতে এই কলা অবস্থান করে। বহির্কোষীয় স্বচ্ছ তরল ধাত্র নিয়ে এই কলা গঠিত। লসিকানালির মধ্যে দিয়ে প্রবহমান এই ধাত্রে লিম্ফোসাইট ও প্রোটিন থাকে। এই কলার কাজ হল লিপিড বস্তুর পরিবহণ করা, বহিরাগত জীবাণু সংক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করা, কলারস পরিশোধন করা।

স্নায়ুকলা: স্নায়ুকোষ ও নিউরোগ্লিয়া দ্বারা গঠিত যে কলা উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তাকে স্নায়ুকলা বলা হয়।

স্নায়ুকলা প্রাণিদেহের স্নায়ুতন্ত্রে অবস্থান করে। এটি অসংখ্য নিউরোন এবং তারও অধিক নিউরোগ্লিয়া দ্বারা গঠিত। এই কলার কাজ হল প্রাণিদেহে উদ্দীপনা গ্রহণ ও তাতে সাড়া দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

মানবদেহের প্রধান অঙ্গ ও তাদের কাজ

অঙ্গ: প্রোটোপ্লাজম দ্বারা গঠিত আবরণবেষ্টিত স্বপ্রজননশীল জীবদেহের গঠনমূলক এবং জৈবনিক ক্রিয়ামূলক একককে কোষ বলে। উৎপত্তিগত ভাবে এক, সম বা বিষম আকৃতিবিশিষ্ট এবং একই প্রকার কাজ সম্পন্ন করে এমন কতগুলি কোষের সমষ্টিকে বলা হয় কলা। যেমন যোগকলা, আবরণী কলা, পেশিকলা, স্নায়ুকলা ইত্যাদি। যখন কয়েকটি কলান্তর মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য কোনও দেহাংশ গঠন করে তখন তাকে অঙ্গ বলে। যেমন— ত্বক, পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, ফুসফুস, প্লীহা, বৃক্ক, ডিম্বাশয়, শুক্রাশয় ইত্যাদি।

মানব দেহের বিভিন্ন অংশের অবস্থান ও তাদের ভূমিকা

ত্বক: ত্বক মানবদেহের বহির্ভাগের আবরণ হিসাবে অবস্থান করে। ত্বকের উপরে অবস্থিত আবরণী কলা অন্তঃস্থ দেহাঙ্গসমূহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে ও দেহে জীবাণু আক্রমণে বাধা দেয়। ত্বকের কোলেক্যালশিফেরল সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ত্বকে ভিটামিন-D সংশ্লেষ করে।

পাকস্থলী: গ্রাসনালি ও ডিয়োডিনামের সংযোগস্থলে অবস্থিত। পাকস্থলীতে প্রোটিন ও ফ্যাটজাতীয় খাদ্যবস্তুর আংশিক পাচন হয়। জল, স্যালাইন, গ্লুকোজ ও কিছু ওষুধ পাকস্থলীতে শোষিত হয় এবং পাকস্থলী কিছু টক্সিক পদার্থ ও উপক্ষার রেচিত করে।

অগ্ন্যাশয়: উদর গহ্বরে পাকস্থলীর নীচে ডিয়োডিনাম ও প্লীহার সঙ্গে অগ্ন্যাশয় সমান্তরালে অবস্থিত। অগ্ন্যাশয় রসের প্যানক্রিয়েটিক অ্যামাইলেজ স্টার্চ, গ্লাইকোজেন ও অন্যান্য জটিল শর্করাকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে, প্যানক্রিয়েটিক লাইপেজ লিপিড পরিপাকে অংশগ্রহণ করে। ইনসুলিন, গ্লুকাগন ও সোমাটোস্ট্যাটিন হরমোন দেহে গ্লুকোজ বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগ প্রতিরোধ করে।

ফুসফুস: ফুসফুস দুটি বক্ষপিঞ্জরের মধ্যে হৃদপিণ্ডের দু'পাশে এবং মধ্যচ্ছদার উপরে অবস্থিত। ফুসফুসের বায়ুথলিতে O_2 ও CO_2-এর বিনিময় ঘটে। নিঃশ্বাস ক্রিয়ার মাধ্যমে দৈনিক গড়ে 600ml জল দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, সেইসঙ্গে দেহতাপও নির্গত হয়।

হৃদপিণ্ড: হৃদপিণ্ডটি বক্ষগহ্বরে ফুসফুস দুটির মাঝখানে ও মধ্যচ্ছদার ওপরে অবস্থিত। হৃদপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে দেহের প্রতিটি অংশে রক্ত পৌঁছয়। ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে O_2 যুক্ত রক্ত ফুসফুস থেকে হৃদপিণ্ডে আসে আবার ফুসফুসীয় ধমনির মাধ্যমে CO_2 যুক্ত রক্ত হৃদপিণ্ড থেকে ফুসফুসে যায়।

প্লীহা: ঊর্ধ্ব উদরগহ্বরের বামদিকে ডায়াফ্রামের নীচে নিম্ন পঞ্জরাস্থি দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। প্লীহা পাকস্থলীর বাঁদিকে অবস্থিত। রক্তস্থিত জীবাণুগুলি লসিকা গ্রন্থির মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় লসিকা গ্রন্থির মধ্যে বিনষ্ট হয়ে যায়। প্লীহা অনাক্রম্যতন্ত্রের উন্নতিসাধনের জন্য লিম্ফোসাইট সৃষ্টি করে এবং রক্ত পরিস্রুতকরণ ও মৃত বয়স্ক কোষকে বিনষ্ট করে।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭

ক্লাস টেন-এর টিউশন: জীবন বিজ্ঞান

জিনগত রোগ

আজ আমরা কিছু জিনগত রোগ নিয়ে জানব। জিনগত রোগ বলতে সেইসব রোগ বোঝায় যা জিনের মাধ্যমে এক জনু থেকে পরবর্তী জনুতে সঞ্চারিত হয়। জিনগত রোগ সাধারণত দুই প্রকার হয়—অটোজোমাল জিন দ্বারা সৃষ্ট রোগ (থ্যালাসেমিয়া, সিকল-সেল অ্যানিমিয়া ইত্যাদি), সেক্স লিংকড জিন দ্বারা সৃষ্ট রোগ (হিমোফিলিয়া, বর্ণান্ধতা)।

থ্যালাসেমিয়া: থ্যালাসেমিয়া হয় প্রধানত অটোজোমে উপস্থিত প্রচ্ছন্ন মিউট্যান্ট জিনের প্রভাবে। থ্যালাসেমিয়া মূলত বংশগত রোগ, যা মানুষের হিমোগ্লোবিনের গঠনগত ত্রুটির ফলে হয়। বর্তমানে এই রোগটি ব্যাপক হারে দেখা যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে।

হিমোগ্লোবিনে গ্লোবিন নামক একপ্রকার প্রোটিন থাকে যা দু'প্রকার হয়। যেমন, আলফা পলিপেপটাইড ও বিটা পলিপেপটাইড। এই আলফা পলিপেপটাইড তৈরির জন্য ১৬ নং হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের প্রতিটি ক্রোমোজোমে দুটি করে অর্থাৎ হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে মোট চারটি জিন থাকে, যার মধ্যে একটি ক্রোমোজোম আসে পিতার থেকে আরেকটি আসে মায়ের থেকে। এই জিনের ত্রুটির জন্য যখন আলফা পলিপেপটাইড পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি হয় না তখন তাকে আলফা থ্যালাসেমিয়া বলে।

এই আলফা পলিপেপটাইড তৈরির ৪টি জিনের ১/২টি জিনের অস্বাভাবিকতা থাকলে রোগ অতটা ক্ষতিকারক হয় না, কিন্তু দুটির বেশি জিনে সমস্যা থাকলে তীব্র থ্যালাসেমিয়া দেখা যায়, যাকে হাইড্রপস ফিটালিস বলে। এক্ষেত্র ভ্রূণ অবস্থায় সন্তানের মৃত্যু অবধি হতে পারে।

অন্যদিকে বিটা পলিপেপটাইড তৈরির জন্য ১১নং হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের প্রতিটিতে একটি করে অর্থাৎ হোমোলোগাস ক্রোমোজোম জোড়ে দুটি জিন থাকে। মায়ের ও পিতার থেকে একটি করে জিন প্রাপ্ত হয়। কোনও কারণে বিটা পলিপেপটাইডের সমস্যা থাকলে সেই থ্যালাসেমিয়াকে বিটা থ্যালাসেমিয়া বলে।

থ্যালাসেমিয়ার লক্ষণ: থ্যালাসেমিয়ার প্রধান লক্ষণ হল রক্তে অক্সিজেনের ঘাটতি। এর কারণে হিমোগ্লোবিন উৎপাদন ঠিকমতো হয় না, ফলে ব্যক্তির শরীরে অ্যানিমিয়া দেখা যায়। এছাড়াও বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জন্ডিস, প্লীহা ইত্যাদি রোগ দেখা যায়। বাড়াবাড়ি হলে ঘনঘন রক্ত বদলানোরও প্রয়োজন পড়ে।

হিমোফিলিয়া: X-ক্রোমোজোমে অবস্থিত মিউট্যান্ট প্রচ্ছন্ন জিনের প্রভাবে যে রক্ততঞ্চন ঘটিত ত্রুটি দেখা যায় তাকে হিমোফিলিয়া বলে। এই হিমোফিলিয়া দুই প্রকার—হিমোফিলিয়া A, হিমোফিলিয়া B।

হিমোফিলিয়া A বা ক্লাসিক হিমোফিলিয়া: এটি ফ্যাক্টর VIII বা অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টরের অভাবে হয়ে থাকে, একে রয়্যাল হিমোফিলিয়াও বলে।

হিমোফিলিয়া B বা খ্রিস্টমাস রোগ: এটি ফ্যাক্টর IX বা প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাস্টিনের অভাবে ঘটে। প্রথম এই রোগটি যার দেহে দেখা যায় তার নাম স্টিফেন খ্রিস্টমাস। পরে এই রোগের বর্ণনা লন্ডনের সায়েন্স জার্নালের খ্রিস্টমাস সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বলে একে খ্রিস্টমাস হিমোফিলিয়াও বলে।

X ক্রোমোজোমে অবস্থিত স্বাভাবিক [+] এবং হিমোফিলিয়া [h] অ্যালিল দুটি দ্বারা মহিলাদের ক্ষেত্রে তিন রকম জিনটাইপ দেখা যায়, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, স্বাভাবিক কিন্তু বাহক, হিমোফিলিয়া আক্রান্ত। পুরুষদের ক্ষেত্রে দু-প্রকার জিনটাইপ দেখা যায়—স্বাভাবিক ও হিমোফিলিয়া আক্রান্ত। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে রোগের প্রকাশ অতটা না হলেও বাহক হওয়ার দরুন তার ৫০% পুত্রসন্তানে এই জিনটি সঞ্চারিত হয়। এইসব পুরুষরা হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত হয়। তাই রোগটি পুরুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

বর্তমানে অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের মধ্যে দিয়ে রোগটিকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। আধুনিক যুগে পরিবেশগত দূষণ ও অন্যান্য বিভিন্ন কারণে জিনের মিউটেশন ঘটা সম্ভব। তাই একটি সুস্থ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই থ্যালাসেমিয়া বাহক স্ত্রী-পুরুষের কখনোই বিয়ে করা উচিত নয়। বিবাহের পূর্বে রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে যদি সেই পুরুষ থ্যালাসেমিয়ার বাহক হন, তাহলে তার সঙ্গে কোনও স্বাভাবিক মহিলার বিয়ে হলে তাদের সন্তান থ্যালাসেমিয়ার বাহক হতেও পারে আবার নাও পারে, কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক পুরুষ যদি থ্যালাসেমিয়া বাহক মহিলাকে বিয়ে করে তবে তাদের সন্তানের মধ্যে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তবে ক্রমাগত কাউন্সেলিংয়ের মধ্যে থেকে কয়েকটি প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া সৃষ্টিকারী জিনগুলি গোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ দূর করতে পারলে দেশকে এই রোগমুক্ত করা সম্ভব। বর্তমানে হিমোগ্লোবিনের প্রকৃতি জানা সম্ভব High Performance Liquid Chromatography পরীক্ষার মাধ্যমে। তবে এই রোগের চিকিৎসার জন্য সেই ব্যক্তির পরিবারের জিনগত ইতিহাস জানা দরকার।

বর্ণান্ধতা: বর্ণান্ধতার মূলত প্রচ্ছন্নধর্মী সেক্স লিংকড জিন বা X ক্রোমোজোমের জন্য। এটি তিন প্রকার হয়—

১) প্রোটানোপিয়া: এই ধরনের রোগী দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর সংবেদনহীন। এরা লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ বর্ণের সাপেক্ষে বর্ণান্ধ।

২) ডিউটেরানোপিয়া: এরা মধ্যম তরঙ্গদৈর্ঘ্য যুক্ত আলোর সংবেদনহীন, এরা সবুজ, হলুদ ও লাল রঙের তফাত করতে পারে না।

৩) অ্যাক্রোমাটোসপিয়া: এই রোগীরা কোনও বর্ণ বা রং-ই দেখতে পায় না।

ক্লাস টেন-এর টিউশন: ভৌতবিজ্ঞান

লেন্স

আজ আমাদের পড়ার বিষয় লেন্স। প্রথমেই জানতে হবে লেন্স কাকে বলে। লেন্স হল সাধারণত দুটি গোলীয়তল বা একটা গোলীয়তল এবং একটা সমতল দ্বারা সীমাবদ্ধ কোনও স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যম। লেন্স আমাদের রোজকার ব্যবহারের জিনিস। চশমা, ক্যামেরা, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, টেলিস্কোপ ইত্যাদি নানারকমের জিনিস তৈরি হয় লেন্সের দ্বারা। এছাড়া আতস কাচের কথা তো আমরা সবাই জানি।

লেন্স সাধারণত দু'রকমের হয়—

১) উত্তল (convex) বা অভিসারী (converging) লেন্স: যে লেন্সের মাঝখানটা মোটা ও দুই প্রান্ত সরু তাকে উত্তল লেন্স বলা হয়। লেন্সের মাধ্যমের থেকে অপেক্ষাকৃত লঘু মাধ্যমে যেমন—বাতাসে, উত্তল লেন্স থাকলে লেন্সের ওপর আপতিত সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ অভিসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হয়। তাই একে অভিসারী লেন্সও বলা হয়।

লেন্সের দুই তলের আকৃতি অনুযায়ী উত্তল লেন্স তিন প্রকারের হতে পারে।

উভোত্তল (Double or Bi convex): যে লেন্সের দুই তলই উত্তল তাকে উভোত্তল লেন্স বলে।

সমতলোত্তল (Plano-convex): যে লেন্সের এক তল সমতল ও আরেকটি উত্তল তাকে সমতলোত্তল লেন্স বলে।

অবতলোত্তল (Concavo-convex): যে লেন্সের একটি তল অবতল ও আরেকটি তল উত্তল তাকে অবতলোত্তল লেন্স বলা হয়।

২) অবতল (concave) বা অপসারী (diverging) লেন্স: যে লেন্সের মাঝখানটা সরু ও দুই প্রান্ত মোটা তাকে অবতল লেন্স বলা হয়। লেন্সের মাধ্যমের থেকে অপেক্ষাকৃত লঘু মাধ্যমে যেমন, বাতাসে, অবতল লেন্স থাকলে লেন্সের ওপর আপতিত সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ অপসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হয়। তাই একে অপসারী লেন্সও বলা হয়।

লেন্সের দুই তলের আকৃতি অনুযায়ী অবতল লেন্স তিন প্রকারের হয়।

উভাবতল (Biconcave): যে লেন্সের দুটি তলই অবতল তাকে অবতলত্তল লেন্স বলা হয়।

সমতলাবতল (Plano-Concave): যে লেন্সের একটি তল সমতল ও আরেকটি তল অবতল তাকে অবতলত্তল লেন্স বলা হয়।

উত্তলাবতল (Convexo-concave): যে লেন্সের একটি তল উত্তল ও আরেকটি তল অবতল তাকে অবতলত্তল লেন্স বলা হয়।

লেন্সের অভিসারী ও অপসারী ক্রিয়ার ব্যাখ্যা: একটি উত্তল লেন্সের মাঝের অংশকে একটি সমান্তরাল ফলক এবং অবশিষ্ট অংশকে কতগুলি ছোট ছোট ও খণ্ডিত প্রিজমের সমষ্টি হিসাবে ধরা যেতে পারে। এইসব প্রিজমের ভূমি প্রধান অক্ষের দিকে থাকে এবং প্রধান অক্ষ থেকে প্রান্তের দিকে গেলে প্রিজমের প্রতিসারক কোণ ক্রমশই বাড়তে থাকে। আমরা জানি, আলোকরশ্মি বায়ুতে থাকা প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় ভূমির দিকে বেঁকে যায় এবং যে প্রিজমের প্রতিসারক কোণ যত বেশি হয়, সেই প্রিজমের ক্ষেত্রে আলোকরশ্মি তত বেঁকে যায় (আলোকরশ্মির চ্যুতি তত বেশি হয়)। তাই কোনও রশ্মি লেন্সের প্রধান অক্ষ থেকে যত দূরে আপতিত হয় রশ্মিটির চ্যুতি তত বেশি হয়। ফলে উত্তল লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসৃত সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ একটি অভিসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হয় এবং প্রধান অক্ষের ওপর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয়। এজন্যে উত্তল লেন্সকে অভিসারী লেন্স বলে।

একইভাবে একটা অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে আনুমানিক এইসব প্রিজমের ভূমি অবতল লেন্সের প্রান্তের দিকে থাকে। এক্ষেত্রেও আলোকরশ্মি প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় ভূমির দিকে বেঁকে যায় অর্থাৎ লেন্সের প্রান্তের দিকে সরে যায়

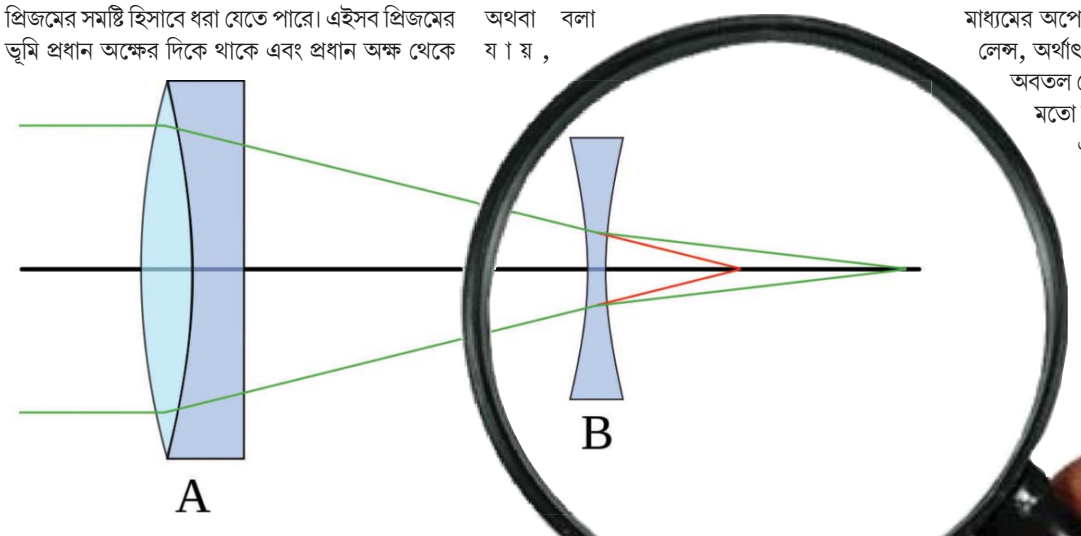

অথবা বলা যায়, লেন্সের প্রধান অক্ষ থেকে দূরে সরে যায়।

প্রধান অক্ষ থেকে যত দূরে আপতিত হয় রশ্মিটির চ্যুতি তত বেশি হয়। ফলে অবতল লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসৃত সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ একটি অপসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হয় এবং প্রধান অক্ষের ওপর একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়। এজন্যে অবতল লেন্সকে অপসারী লেন্স বলে।

মনে রাখতে হবে, সাধারণ ভাবে উত্তল লেন্স অভিসারী লেন্সের মতো এবং অবতল লেন্স অপসারী লেন্সের মতো আচরণ করে। তবে লেন্সগুলি যখন এমন একটি মাধ্যমের মধ্যে থাকে যার প্রতিসারাঙ্ক লেন্সের উপাদানের প্রতিসারাঙ্ক অপেক্ষা কম তখনই এ ধরনের আচরণ দেখা যায়। কিন্তু যদি লেন্সের উপাদানের প্রতিসারাঙ্ক পারিপার্শ্বিক মাধ্যমের অপেক্ষা কম হয় তাহলে উত্তল লেন্স অপসারী লেন্স, অর্থাৎ অবতল লেন্সের মতো আচরণ করে এবং অবতল লেন্স অভিসারী লেন্স, অর্থাৎ উত্তল লেন্সের মতো আচরণ করে।

এবার দুটি সংজ্ঞা জেনে নাও:

বক্রতা কেন্দ্র (Centre of curvature): লেন্সের দুটি তলই সাধারণত গোলীয় হয়। ওই দুটি তল যে গোলক দুটির অংশ তাদের কেন্দ্র দুটিকে লেন্সের বক্রতা কেন্দ্র বলা হয়।

বক্রতা ব্যাসার্ধ (Radius of curvature): লেন্সের দুটি বক্রতল যে গোলক দুটির অংশ তাদের ব্যাসার্ধ দুটিকে লেন্সের বক্রতা ব্যাসার্ধ বলে।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

প্রথম পাতার পর

যাবে। বাড়তি চাপও পড়বে না।

শুধু সারাদিন পড়াশোনা করলেই চলবে না। একজন পড়ুয়ার পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক বিকাশেরও প্রয়োজন। আগে একটা সময় খেলাধূলা করার প্রবণতা ছিল কিন্তু বর্তমানে পড়ুয়ারা পড়াশোনার সময় বাদ দিলে তারা কম্পিউটার নিয়ে বসে যায়, ফলে তাদের মানসিক বিকাশ হচ্ছে কিন্তু দৈহিক বিকাশ অপূর্ণই থেকে যাচ্ছে। কিন্তু মানসিক বিকাশের উন্নতির জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত খেলাধূলা, ব্যায়াম এইগুলি খুব জরুরি বিষয়।

পড়ুয়াদের বাড়িতেও নিজস্ব রুটিন মেনে পড়াশোনা করতে পারলে খুব ভালো হয়। তবে সে যদি নিজে নিজের সুবিধামতো একটি রুটিন তৈরি করতে পারে, কারণ একজন পড়ুয়া নিজেই বুঝবে কোন বিষয়টি আগে পড়া উচিত, ও কতটা জরুরি। কোনও কিছুই একজন পড়ুয়ার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।

ভারতের সর্বকালের সেরা শিক্ষক ও তাঁদের অবদান

আজ দেশের প্রতিটি স্কুলে পালিত হচ্ছে ‘শিক্ষক দিবস’। প্রতিটি স্কুলে, কলেজে বা নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজের প্রিয় শিক্ষককে সম্মান জানাতে ব্যস্ত ছাত্রছাত্রীরা। এই শিক্ষকরা তো রয়েইছেন যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে কাছে থেকে প্রতিটি যুবসমাজকে সাহস দিচ্ছেন, এগিয়ে চলার প্রেরণা জোগাচ্ছেন। তাঁদের এই কর্মকাণ্ড সত্যিই তারিফ করার মতো। তবে এছাড়াও কিছু মানুষ যাঁরা ভারতের মাটিতে জন্মে আমাদের সবাইকে গর্বিত করেছেন, নিজেদের শিক্ষা, চেতনা ও আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে জাতির জ্ঞানচক্ষুকে খুলে দিয়েছেন। সেই মনীষীরাও আমাদের প্রত্যেকের শিক্ষক।

রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ ও সদ্য প্রয়াত এপিজে আবদুল কালাম। প্রত্যেকেই শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন জাতির মধ্যে। এমনই কিছু মনীষীদের শিক্ষায় অবদানের কথা জেনে নিই আজ...

ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ:

তামিলনাড়ুতে জন্মগ্রহণ করা এই মানুষটি পুথিগত বিদ্যার চেয়েও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপর বেশি ভরসা রেখেছিলেন। মাত্র ২১ বছর বয়সে দর্শনে স্নাতকোত্তর শেষ করে তৎকালীন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ানো শুরু করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত শিক্ষাক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ: কলকাতার এই মানুষটিই প্রথম ভারতের নামকে বিশ্বসভায় উঁচুতে তুলে ধরেন। তাঁর শিক্ষা যুবসমাজের চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য কিছু করার তাঁর ভাবনা জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক এটাই চেয়েছিলেন তিনি।

গৌতম বুদ্ধ: জিশুখ্রিষ্টের জন্মের আগে

৪৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নেপালে জন্ম নেন গৌতম বুদ্ধ। যুবক বয়সে তিনি জাগতিক সুখকে ত্যাগ করে তিনি সাধনায় ব্রতী হন। তাঁর ভাবনা, আদর্শ আমাদের সকলের পাথেয়।

মহর্ষি বাল্মিকী: সংস্কৃতের মহাপণ্ডিত

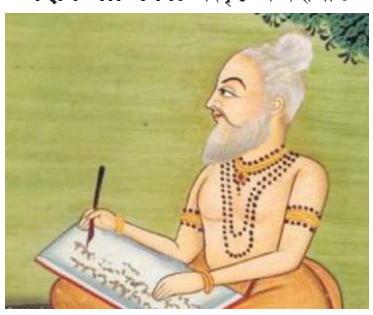

ছিলেন মহর্ষি বাল্মিকী। রামায়ণ, রামচরিতমানসের মতো কাব্যগ্রন্থের জনক এই বিদ্বান মানুষটি।

বেদব্যাস: মহাভারত রচনা করেন

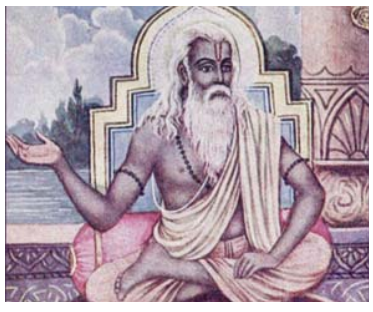

বেদব্যাস। বিষ্ণুর অবতার ছিলেন বেদব্যাস, এমনটাই মনে করা হয়। বেদের আসল সংস্করণকে চার ভাগে ভাগ করে ঋক, সাম, যজু, অথর্বে ভাগ করেন তিনিই।

রামকৃষ্ণ পরমহংস: পুথিগত শিক্ষা না

থেকেই কীভাবে নিজের এবং অন্যের জ্ঞানচক্ষুর পর্দা খুলতে হয়, তা রামকৃষ্ণের চেয়ে ভালো কেউ পেরেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর জ্ঞান, চেতনা, দিব্য ভাবনায় তিনি ঈশ্বরের দেখা পেয়েছিলেন। এমন মানুষের কথা আমাদের সকলের পাথেয়।

শঙ্করাচার্য: ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করা শঙ্করাচার্য কুসংস্কারের সঙ্গে লড়াই করে

গিয়েছেন। চেতনার জাগরণ ঘটানোর এটা মস্ত বড় একটি দিক, বিশেষ করে সেই সময়ের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতে। এমন শিক্ষক আজকের দিনেও প্রয়োজন রয়েছে।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী: আর্য সমাজের

প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদিক ধারণার সংস্কার সাধন করেন তিনি। আধুনিক ভারতের অন্যতম রূপকার তিনি।

চাণক্য: ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা

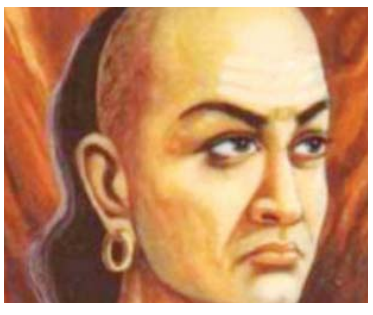

চাণক্য ছিলেন মস্ত অর্থনীতি বিশারদ, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ। প্রাচীন ভারতে অর্থশাস্ত্রের পাঠ পড়ান তিনিই। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন তিনি।

আর্যভট্ট: বিখ্যাত গণিতবিদ ও

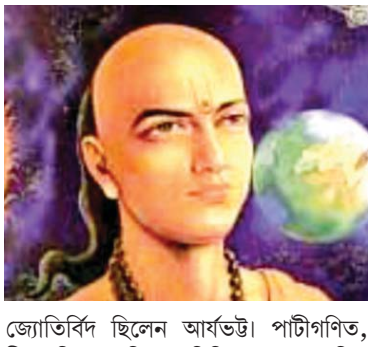

জ্যোতির্বিদ ছিলেন আর্যভট্ট। পাটীগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি-সহ একাধিক গাণিতিক বিষয় আবিষ্কার করেন তিনি।

রাজা রামমোহন রায়: ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ হিসাবে ডাকা হয় রাজা রামমোহন রায়কে। অসম্ভব পণ্ডিত এই মানুষটি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সারা জীবন লড়ে গিয়েছেন। সতীদাহ প্রথা রদ করা, পণপ্রথার বিরুদ্ধে সরব হওয়া এসবেরই বহিঃপ্রকাশ।

আধুনিক ভারত গড়তে তাঁর অন্যতম অবদান রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: শিক্ষার আলো শুধু নিজের রচনার মধ্য দিয়ে নয়, কাজের মধ্য দিয়েও ছড়িয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ। বোলপুরের

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করেন কবিগুরু যা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: প্রথম বাংলা

লিপি সংস্কার করে তাকে যুক্তিবহ করে তোলেন বিদ্যাসাগরই। তিনিই বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার। শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচয় সহ, একাধিক পাঠ্যপুস্তক, সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু রচনা সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

এপিজে আবদুল কালাম: ভারতের

‘মিসাইল ম্যান’ নামে খ্যাত এই প্রথিতযশা বিজ্ঞানী শুধু বিজ্ঞানের দিক থেকেই ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাননি। শিক্ষাকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। জীবনের শেষ মুহূর্তেও তিনি ছাত্রছাত্রীদের মাঝেই বক্তৃতা করতে করতে প্রাণত্যাগ করেন।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭

ক্যুইজ

১) সূর্যের ব্যাস কত?
২) কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে মহাকাশচারীরা আকাশকে কী রঙের দেখেন?
৩) কোনও বস্তুর ঘনত্ব বলতে কী বোঝায়?
৪) জলে শব্দের গতিবেগ কত?
৫) আলোর ক্ষেত্রে মূল রং কটি?
৬) হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন ও রোডন গ্যাসকে একসঙ্গে কোন গ্যাস বলে?
৭) কোন কোন ধাতু মিশিয়ে ইস্পাত তৈরি করা হয়?
৮) পৃথিবীর বৃহত্তম নদী অববাহিকার নাম কী?
৯) উরুগুয়ের রাজধানীর নাম কী?
১০) কোন দেশকে চিরবসন্তের দেশ বলে?
১১) গঙ্গোত্রী হিমবাহের উচ্চতা কত?
১২) বানম কার উপনদী?
১৩) কার্ডামম পাহাড়ের সবচেয়ে দক্ষিণের গিরিপথটির নাম কী?
১৪) উৎসের কাছে ব্রহ্মপুত্র কী নামে পরিচিত?
১৫) মধ্যপ্রদেশের কোথায় আকরিক লোহা পাওয়া যায়?
১৬) শিশির কখন তৈরি হয়?
১৭) জব্বলপুর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
১৮) জাপান দেশের আদিকালে কী নাম ছিল?
১৯) স্ট্রেপটোমাইসিন কে আবিষ্কার করেন?
২০) কীজন্য শৈত্যের উৎপত্তি হয়?
২১) স্ফুটনে কী পরিবর্তিত হয় না?
২২) কুয়াশা কোথায় বেশি সৃষ্টি হয়?
২৩) আণবিক বোমাতে কীরকম বিক্রিয়া ঘটে?
২৪) ব্যারাইটা কোন কাজে ব্যবহার করা হয়?
২৫) শব্দের উসকে কী বলে?
২৬) তেজস্ক্রিয় পদার্থের খনিতে কোন পদার্থটি অবশ্যই পাওয়া যায়?
২৭) ডিনামাইটের মূল উপাদান কী?
২৮) বারবিটোন কী কাজে ব্যবহার করা হয়?
২৯) অর্ধপরিবাহী হিসাবে কোন মৌলকে ব্যবহার করা হয়?
৩০) কোন প্রক্রিয়ার সাহায্যে দুটি আইসোটোপকে আলাদা করা হয়?
৩১) কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা বাড়ালে তড়িৎ চুম্বকের কী হয়?
৩২) সাধারণ তুলাযন্ত্রের সাহায্যে কী মাপা হয়?
৩৩) নর্মদা নদীর উৎপত্তিস্থল কোথায়?
৩৪) সপ্তগ্রাম কীজন্য বিখ্যাত?
৩৫) আমীর খসরু কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন?
৩৬) ম্যাকমোহন লাইন কী?
৩৭) লাঙ্গল পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
৩৮)ওড়িশার দামনজোড়ি কীজন্য বিখ্যাত?
৩৯) সিস্টোলিথ কোথায় থাকে?
৪০) প্রাকৃতিক বিপর্যয়বাদের স্রষ্টা কে?

উত্তর: ১) ১৩ লাখ ৮৪ হাজার কিলোমিটার। ২) কালো। ৩) প্রতি একক আয়তনের ভর। ৪) ১৪০০ মিটার। ৫) ৩টি। নীল, হলুদ ও ম্যাজেন্টা। ৬) নিষ্ক্রিয় বা নোবেল গ্যাস। ৭) লোহা ও কার্বন। ৮) আমাজন নদী অববাহিকা। ৯) মাল্টিভিডিও। ১০) কুইটো দেশকে। ১১) ৬৬১৪ মিটার। ১২) চম্বল নদীর। ১৩) শেঙ্কোটা। ১৪) সাংপো। ১৫) দাল্লিরাজহারা। ১৬) মেঘে ঢাকা ঠান্ডা রাতে। ১৭) নর্মদা নদী। ১৮) য়ামাটো। ১৯) বিজ্ঞানী ওয়াকসম্যান। ২০) বাষ্পায়নের জন্য। ২১) উষ্ণতা। ২২) শিল্পাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে। ২৩) নিউক্লিয়ার ফিশন। ২৪) কাচ তৈরিতে। ২৫) স্বনক। ২৬) সিসা। ২৭) নাইট্রোগ্লিসারিন। ২৮) ঘুমের ওষুধ রূপে। ২৯) সিলিকন। ৩০) ব্যাপন। ৩১) মেরুশক্ত বাড়ে। ৩২) বস্তুর ভর। ৩৩) অমরকণ্টক। ৩৪) বাংলার বিখ্যাত বন্দর। ৩৫) সেতার। ৩৬) ভারত-তিব্বত সীমারেখা। ৩৭) কবি নজরুল ইসলাম। ৩৮) অ্যালুমিনিয়াম। ৩৯) বটপাতায়। ৪০) বিজ্ঞানী কুভিয়ার।

এডু অ্যাডভাইস

ছোট থেকেই সহবত শেখানোর দায়িত্ব বাবা-মাকেই নিতে হয়

একজন অভিভাবকের জীবনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তার সন্তানকে সুন্দরভাবে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। ছোট থেকেই তাকে সহজভাবে নিজেদের আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে আদবকায়দা, সহবত শেখাতে হবে। কারণ ছোট থেকে যে অভ্যাসগুলি তাকে শেখানো হবে তার মাধ্যমেই সে আস্তে আস্তে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। ছোট বয়সটাই হল একটি শিশুকে কোনও কিছু শেখানোর সবথেকে উপযুক্ত সময়। দুই থেকে পাঁচ বছর বয়স বাচ্চাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টাই বাচ্চাদের চরিত্র গঠনের উপযুক্ত সময়। পাঁচ বছর হওয়ার আগেই কিছু বিষয়ে অভ্যস্ত করে তুলুন আপনার সন্তানকে। অনেক বাবা-মা মনে করেন এটি খুব অল্প বয়স বাচ্চাদেরকে নৈতিকতা শেখানোর। কিন্তু এটি ভুল ধারণা। সাধারণত ছোট বয়সে বাচ্চাদের যা শেখানো হয়, সেটি তারা সারাজীবন মনে রাখে। কিছু বিষয় আছে যা পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে প্রতিটি বাচ্চার শেখা উচিত।

আপনার বাচ্চাটির বয়স পাঁচ বছরে পৌঁছনোর আগে সততার বিষয়টির সম্পর্কে তাকে অবগত করুন। সে যেন সবসময় সত্য কথা বলে। ছোটখাটো মিথ্যাকেও প্রশ্রয় দেবেন না। এটি তার মিথ্যা বলার প্রবণতা বাড়িয়ে দেবে। মিথ্যা বলা, ঠকানো বা চুরি করার মতো কোনও বিষয়কে অবহেলা করবেন না ও প্রশ্রয় দেবেন না। সবসময় সত্য কথা বলা শেখান। যদি সে মিথ্যা বলে সেটি নিয়ে খুব বেশি রাগারাগি করবেন না। বরং কীভাবে সে সত্য কথা বলবে সেটি তাকে শেখান। সেইসঙ্গে তার সামনেও নিজেকে সেইভাবে পেশ করবেন। কারণ মনে রাখবেন শিশু কিন্তু প্রথমে সে তার বাবা-মাকেই অনুসরণ করে।

সেই সঙ্গে তাকে ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে শেখান দায়িত্ববোধ। শুনতে অদ্ভুত শোনালেও এটি সত্য। ছোট বয়সে যদি বাচ্চারা দায়িত্ব নেওয়া শিখে যায় তবে ভবিষ্যতে তারা একজন দায়িত্ববান মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। খুব বেশি কাজের দায়িত্ব তাদের উপর চাপাবেন না। ছোট ছোট কাজ যেমন নিজের খেলনাটা ঠিকমতো দেখে রাখা, ঠিক জায়গায় গুছিয়ে রাখা, ময়লা কাপড় লন্ড্রি বাস্কেটে রাখা, অথবা ছোট ভাই বা বোনটির যত্ন নেওয়া। এই ছোট ছোট বিষয়গুলো তার মধ্যে দায়িত্ববোধ তৈরি করে।

সংকল্প ছাড়া কোনও বাচ্চা তার কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারে না। এটি শুধু বাচ্চার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সংকল্প ছাড়া কেউ কোনওদিন জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তাই এই বিষয়টির সঙ্গে ছোট থেকে বাচ্চাদের পরিচয় করিয়ে দিন।

আপনার শিশুর সামনে যদি অন্য কোনও বাচ্চা পড়ে যায়, তাহলে তাকে সাহায্য করতে শেখান। তার জন্য আপনি এগিয়ে এসে ওই শিশুটিকে সাহায্য করুন। অন্যের কষ্টে সে যেন খুশি না হয়। এটি তাকে হিংসা থেকে দূরে রাখবে। অন্যের কষ্টে খুশি হওয়ার কিছু নেই, এই ঘটনাটি তার সঙ্গেও হতে পারত— এই বিষয়টি তাকে বুঝিয়ে বলুন। গরিব মানুষের দুঃখ কষ্ট তাকে বোঝান এবং অনুভব করতে সাহায্য করুন।

এটি খুব জরুরি একটি বিষয়। বড়দের সম্মান করার পাশাপাশি ঘরের গৃহকর্মীকেও সম্মান করতে শেখান। অনেক সময় বড়দের দেখাদেখি বাচ্চারা ঘরের গৃহকর্মীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে থাকে। তাই পরিচারিকার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার আগে একবার ভাবুন আপনার বাচ্চাটিও কিন্তু এই শিক্ষা পাচ্ছে। তাই কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার আগে দু'বার ভাবুন। আপনি যা করবেন আপনার সন্তান আপনার দেখা দেখি তাই শিখবে। ভালো-খারাপ বিচার করার ক্ষমতা কিন্তু তার তখন থাকে না। তাই একজন অভিভাবককে খুব সচেতন ভাবে এগোনো উচিত।

হেল্‌থ অ্যাডভাইস

শিশুদের বিকাশে পুষ্টিকর খাদ্য

পৃথিবীর সব দুঃখ ভুলে যাওয়া যায় ওদের সারল্য দেখে। কখনও আধো আধো কথা বা কখনও দুষ্টুমি করে পুরো ঘরকে হাসিখুশিতে মাতিয়ে রাখে ওরা। সারাদিন এঘর-ওঘর থেকে ছোটাছুটি করেও শিশুরা দমবার পাত্র নয়। একজায়গাতে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখাই একরম মুশকিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়াতে বসাতে গিয়েও শুরু হয় নানা বদমায়েসি। কিছুতেই পড়তে চায় না তারা। পড়তে গিয়েও শুরু হয় নানান টালবাহানা। কখনও শিশুরা পড়ার সময় কোনও কারণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। অভিভাবকেরা যখন কোনও কিছু শেখান তখন তারা বেশিরভাগ সময়ে এক জিনিস বার বার ভুল করে। শিশুর এই ধরনের আচরণ আপনার মনে নানা চিন্তার উদ্রেক করে। অভিভাবকেরা মনে করেন তার সন্তানের হয়তো আর পড়াশোনা হবে না, বা সে বুদ্ধিদীপ্ত নয়। সন্তানের মধ্যে হয়তো কোনও সমস্যা তৈরি হয়েছে।

ছোট শিশু একটু দুষ্টুমি করবে এটাই স্বাভাবিক। তবে তার বেড়ে ওঠার পাশাপাশি বুদ্ধির বিকাশও জরুরি। আর এর জন্য শিশুর খাবারের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। এমন কিছু খাবার আছে যা শিশুর মস্তিষ্ক সক্রিয় ও সতেজ রাখে। আর মস্তিষ্ক সক্রিয় এবং সতেজ থাকলে শিশুর মেধা ও বুদ্ধির বিকাশ হয়।

আসুন দেখা নেওয়া যাক শিশুর মেধা বিকাশে কোন কোন খাবার সহায়ক।

মায়ের দুধ: শিশুকে অন্তত দু'বছর বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত। কারণ মায়ের দুধ পান করলে শিশুর বুদ্ধিমত্তা বাড়ে।

ডিম: ডিমে রয়েছে প্রচুর আয়রন। যা লোহিত কণিকা তৈরি করে রক্তের উপাদানে সঠিক মাত্রা বজায় রাখে। এতে মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ হয়। যা চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা বাড়ায়। গবেষণায় দেখা যায়, যারা প্রতিদিন অন্তত একটি ডিম খায় তাদের স্মৃতিশক্তি অন্যদের তুলনায় অন্তত ৭০% বেশি ভালো থাকে।

আখরোট: আখরোটে অনেক বেশি পরিমাণে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। এটি শিশুসহ সব বয়সিদেরই মস্তিষ্কের যে কোনও রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

বাদাম: শিশুকে প্রতিদিন বাদাম খেতে দিন। কাজুবাদাম, পেস্তাবাদাম, চিনাবাদামসহ যে কোনও ধরনের বাদামই শিশুর মানসিক বৃদ্ধিতে সহায়ক। কারণ

বাদামে রয়েছে 'ভিটামিন ই' যা মস্তিষ্কের সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা বাড়ায়।

ব্লু বেরি: বুদ্ধি বিকাশে ব্লু বেরির জুড়ি নেই। এতে আছে ফ্ল্যাভোনয়েডস। তাই ব্লু বেরিকে ব্রেইনের জন্য সবচেয়ে কার্যকর খাবার বলে মনে করা হয়।

ডার্ক চকলেট: ডার্ক চকলেটে থাকে ৭৫ শতাংশ কোকো যা শিশুর মেধা ও বুদ্ধির বিকাশের জন্য উপকারী। ডার্ক চকলেট মস্তিষ্কে নিউরন তৈরি করে যা নতুন বিষয় মনে রাখতে সাহায্য করে।

শাকসবজি: শাকসবজিও শিশুর মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। পালং শাকে রয়েছে উচ্চমাত্রায় 'ভিটামিন কে' এবং বিটা ক্যারোটিন। যা শিশুর স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। পুষ্টিগুণে গুণান্বিত টমেটো। এটি মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

সামুদ্রিক মাছ: মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াতে সামুদ্রিক মাছ বেশ উপকারী। মস্তিষ্কে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিডের ৪০ শতাংশ হচ্ছে ডিএইচএ, যা সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেলে পাওয়া যায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড হিসেবে। তাই শিশুর বয়স এবং দেহের গঠন অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেল সপ্তাহে অন্তত ৩ দিন খাওয়ানো যেতে পারে।

বিভিন্ন ফল: শিশুর প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন জাম, লিচু, স্ট্রবেরি বা আঙুরের মতো ফলগুলো। কারণ এ ফলগুলোতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা ব্রেইনের কোষের অক্সিডেশন এবং ক্রমাগত ক্ষয়ে যাওয়া রোধ করে ব্রেইনের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

এছাড়াও, গম, আমলকী, পেঁয়াজ, কালোজিরা, আপেল, কুমড়ো বীজ, মধু, খেঁজুর ও বীট শিশুর স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সহায়তা করে।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭

ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির প্রবক্তা ছিলেন
সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

অচিন্ত্যকুমার মাইতি
(অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক)

বিংশ শতকে ভারতবর্ষের বুকে যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই স্পর্শে সাহিত্য, সংস্কৃতি, কলা, বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে এসেছিল এক অভূতপূর্ব অগ্রগতি এবং সে পরিবর্তনের ভাবধারায় যাঁদের অবদান অবিস্মরণীয় তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ভারতীয় দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। তিনি ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের একজন প্রথম সারির দার্শনিক। তাঁর পাশ্চাত্য দর্শনতত্ত্বে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা তাঁকে পাশ্চাত্য ও ভারতের মধ্যে এক আত্মিক সেতুবন্ধনের সুযোগ করে দিয়েছিল। রাধাকৃষ্ণণকে পশ্চিমের বুদ্ধিজীবীদের সামনে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে তুলে ধরা হত। তাঁর জীবনবৃত্তান্ত সম্পূর্ণভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর জীবন একটি তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে

কেটেছে— অদম্য মনোবল ও প্রতিভার এক সমন্বয়ের মাধ্যমে বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর দর্শনশাস্ত্রে অবদানের জন্য তিনি দর্শনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হয়ে আজও বিরাজ করছেন।

রাধাকৃষ্ণণের জন্ম অন্ধ্রপ্রদেশের থিরুভাল্লুর জেলার তিরুতানি শহরে ১৮৮৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর এক দরিদ্র নিষ্ঠাবান তেলেগু ব্রাহ্মণ পরিবারে । পিতা সর্বপল্লী বীরাস্বামী ও মাতা সীতাম্মা দুজনেই শঙ্করাচর্যের অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এই পরিবেশই পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণণকে ভারতীয় দর্শনের সুপণ্ডিত হতে সাহায্য করেছিল। বিজ্ঞজনের কথায়, প্রাতঃকাল দিবসের সূচনা করে, বাল্যকালেই অধিকাংশ মানুষের জীবনের গতিপথ নির্দিষ্ট হয়, ভবিষ্য জীবনের পথনির্দেশ মেলে। সেই প্রাসঙ্গিকতা মেলে রাধাকৃষ্ণণের জীবনে। রাধাকৃষ্ণণের অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে শিশুকাল থেকেই। যতদিন যায়, ততই তাঁর ভারতীয় দর্শনের প্রতি জ্ঞানস্পৃহা বাড়তে থাকে। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় তিরুতানির প্রাইমারি বোর্ড হাইস্কুলে। ১৮৯৬ সালে তাঁকে পাঠানো হয় তিরুপতির হারমানসবার্গ ইভানজেলিকাল লুথেরাল মিশন স্কুলে। সমগ্র ছাত্রজীবনে তিনি বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। স্কুলজীবনের পাঠ শেষ করে তিনি ভেলোরের ভোরহিস কলেজে ভর্তি হন এবং পরে ১৯০৪ সালে মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বিএ-তে ভর্তি হন। এসময়ে রাধাকৃষ্ণণ স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ও ভিডি সাবারকারের'The First War of Indian Independence' পড়ে অভিভূত হন এবং এগুলি পড়ে তাঁর পারমার্থিক সত্তার পূর্ণ উপলব্ধি' সম্পর্কে জ্ঞান হয়। স্বামীজির রচনা তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, সহনশীলতা, হিন্দুত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। স্বামীজির গ্রন্থগুলি হিন্দুত্ববোধের আকরগ্রন্থ। এগুলি পাঠ করে তিনি যে দৃঢ়তা লাভ করেছিলেন তা শুধু দর্শন শিক্ষাতে কাজে লাগেনি, ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করেছিল। তাঁর হিন্দুত্বের উপর জ্ঞানচর্চার প্রতিফলন ঘটল পরবর্তীকালে কয়েকটি লেখনীর মধ্য দিয়ে। ১৯০৬ সালে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে বিএ পাশ করেন এবং কলেজ থেকে ১৯০৮ সালে দর্শনশাস্ত্রে এমএ পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেন। এমএ পড়াকালীন তিনি' The Ethics of Vedanta and its Metaphysical Presuppositions'থিসিস হিসাবে লেখেন। দর্শনশাস্ত্রের প্রথিতযশা অধ্যাপক ড. আলফ্রেড জর্জ হগ্ থিসিস পড়ে রাধাকৃষ্ণণের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। থিসিস পেপারটি পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়, রাধাকৃষ্ণণের বয়স তখন মাত্র ২০ বছর। এই সময়ে তিনি দর্শনশাস্ত্রের দিকপাল বার্কলে, লিবনিজ, লোকে, স্পিনোজা, কান্ট, জেএস মিল, হারবার্ট স্পেনসর, হেকুয়েল, অ্যারিস্টটল এবং প্লেটো প্রমুখের গ্রন্থগুলি পড়ে ফেলেছেন। কলেজে পড়ার সময় খ্রিস্টানদের মুখে হিন্দুত্বের বিরূপ সমালোচনা শুনে রাধাকৃষ্ণণ খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সেদিন খ্রিস্টানদের সমালোচনা তাঁকে হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে জানার আগ্রহ আরও চ্যালেঞ্জের দিকে ছুড়ে দিয়েছিল। ব্রিটেনে বৃত্তি নিয়ে পড়তে যাওয়ার তাঁর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রক্ষণশীল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে হওয়ায় তাঁকে বাড়ি থেকে ব্রিটেন যাওয়ার ব্যাপারে বাধা দেওয়া হল। তিনি জানতেন হাজার চেষ্টা করলেও মাদ্রাজে তাঁর চাকরি পাওয়া খুব দুঃসাধ্য। অবশেষে ১৯০৯ সালে মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজের অধ্যাপক উইলিয়াম স্কিনারের সহায়তায় তাঁর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি অস্থায়ী অধ্যাপনার চাকরি হয়। কলেজে তাঁর অধ্যাপনার বিষয় ছিল মনস্তত্ত্ববিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র। সেসময়ে তিনি সংস্কৃত শিখতেন। ১৯১৮ সালে তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। ১৯১১ সালে The International Journal of Ethics-তে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ The Ethics of the Bhagavadgita and Kant' প্রকাশিত হয় এবং পাঠকমহলে প্রবন্ধটি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। এরপর থেকে তাঁর লেখনী আর থেমে থাকেনি।

১৯১৪ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণণের মোট আঠারোটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেগুলি The International Journal of Ethics', The Quest', The Journal of Philosophy', The Monist and Mind' প্রভৃতি বিখ্যাত জার্নালে প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি রবীন্দ্রনাথের দর্শনতত্ত্বের প্রতি অনুরক্ত হন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারায় মিল খুঁজে পেয়ে দর্শনতত্ত্বের উপর প্রথম গ্রন্থ The Philosophy of Rabindranath Tagore' প্রকাশ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন রবীন্দ্রনাথের দর্শন ভারতীয়দের জীবনীশক্তির মূল অভিব্যক্তি। ১৯২০ সালে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ The Reign of Religion in Contemporary Philosophy' প্রকাশিত হয়। তাঁর সবকটি প্রবন্ধ বা গ্রন্থে হিন্দুত্ব নিয়ে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং দর্শনের প্রেক্ষাপটে হিন্দুত্বের সুন্দর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৯২১ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসাবে নিযুক্ত হলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। আচার্য শীল এর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক George V Chair' পদে ছিলেন। তাঁর স্থলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একজন দক্ষ দর্শনশাস্ত্রের লোক খোঁজ করছিলেন। অবশেষ তিনি ওই পদে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে নিয়োগপত্র দিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর তাঁর দু'খণ্ডে 'ভারতীয় দর্শন' প্রকাশিত হয়। এই দুটি খণ্ডের জন্য তাঁর খ্যাতি ভারতবর্ষ তথা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৬ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আপটন বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং বক্তৃতাটি 'The Hindu View of Life' নামে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ সালে হিব্বার্ট' বক্তৃতা দেন। এটিও পরবর্তীকালে An Idealist View of Life' প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি তৎকালীন সমাজের বিদগ্ধজনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৩১ সালে দর্শনশাস্ত্রে অভূতপূর্ব কৃতিত্বের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সময়ে তিনি অক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে যোগ দেন। এখানে পাঁচ বছর উপাচার্য পদে থাকার পর ১৯৩৬-৩৮ সাল পর্যন্ত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩৯ সালে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিনের জন্য উপাচার্য পদে থাকার পর তিনি পুনরায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন। এখানে তিনি ১৯৩৯-৪১ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৩-৩১ এবং ১৯৩৯-৪১ সাল মোট বারো বছর অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকার ফলে তিনি কলকাতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। সেই কারণে তাঁর মুখ থেকে ব্যক্ত হয়েছিল— 'কলকাতা আমার দ্বিতীয় জন্মভূমি'। তিনি দেশ-বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং সম্মানিত পদ অলংকৃত করেন।

১৯৪৯-৫২ সাল পর্যন্ত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে রাধাকৃষ্ণণ সোভিয়েত রাশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫২-১৯৬২ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং ১৯৬২-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হন। এটি ভারতীয় গণতন্ত্রের গৌরবের বিষয় যে, রাজনীতি থেকে মুক্ত এমন একজন বিদগ্ধ শিক্ষাবিদকে রাষ্ট্রপতি পদে বসানো হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে তাঁকে জাতির সর্বোচ্চ সম্মান ভারতরত্ন'-তে ভূষিত করা হয়। প্রেসিডেন্ট পদে রাধাকৃষ্ণণ বসার পর বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি মন্তব্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে— It is an honour to philosophy that Dr. Radhakrishnan should be President of India and I , as a philosopher, take special pleasure in this. Plato aspired for philosophers to become kings and it is a tribute to India that she should make a philosopher her President.' রাধাকৃষ্ণণ ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি খুব আস্থাশীল ছিলেন। ১৯৬৭ সালের ১২ মে জাতির উদ্দেশে তাঁর বিদায়কালে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল— It was a way of life and a regime of civilized conduct of human affairs. We should be the architects of peaceful changes and the advocates of radical reform'. ১৯৭৫ সালের ১৭ এপ্রিল এই প্রবাদ পুরুষের জীবনাবসান ঘটে।

শিক্ষকতাই ছিল তাঁর একমাত্র পচ্ছন্দের বিষয়। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত থাকার ফলে বহু শিক্ষক তাঁর সান্নিধ্যে এসে সমৃদ্ধ হয়েছেন, যাঁরা তাঁর শিক্ষকতার অধীনে ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ঋণী। তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় রাষ্ট্রদূত হোন বা উপরাষ্ট্রপতি হোন বা রাষ্ট্রপতি হোন যে পদেই অধিষ্ঠিত থাকুন, জাতির কাছে তিনি সারাজীবন শিক্ষক হয়েই থাকবেন। সেজন্য ১৯৬২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন ৫ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষক দিবস' হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তাঁকে এই সম্মান জানিয়ে নেহরু বলেন— He served his country in many capacities. But above all, he is a great teacher from whom all of us have learnt much and will continue to learn. It is India's peculiar privilege to have a great philosopher, a great educationist and a great humanist as her President. That in itself shows the kind of men we honour and respect'. সেদিন থেকেই প্রতি বছর এই দিনটিতে 'শিক্ষক দিবস' হিসাবে সারা ভারতবর্ষে অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়।

উত্তরণ-এর
জেনারেল নলেজ
তোমাদের কেমন
লাগছে, মেল করে
জানাও আমাদের